KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ~~২৪২~~ ২৪২ বি/১ রাজুঁস গ্যারেজিস্ট্রি লেক - ৯, কলকাতা - ৫৫
Collection : KLMLGK	Publisher : দেবানী মুখোপাধ্যায়
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 1 2 3 4 5	Year of Publication : Summer 1997 Aug 1997 Dec 1997 Dec 1998-99 May 1999
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : ?	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অনার্য সাহিত্য

স্বাধীন লেখকদের প্রমুক্ত উচ্চারণ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন, লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥

What the caterpiller
calls the end of the world
the master calls a
butterfly.

Then may we lay down that, begining with Homer, all the poets are imitators of images of virtue and of all other subjects on which they write, and do not lay hold of truth ;

নবপর্যায়
১. গ্রীষ্ম ১৯৯৭

অনার্য সাহিত্য

নবপর্যায় ·১· গ্রীষ্ম ১৯৯৭

কথা ঃ

জীবন সংশ্লিষ্ট এক কাব্যধারা সহস্র বছর ধরে বহমান স্পর্ধিত বর্ণময়তায়। প্লেটোর কল্পরাজ্য থেকে কবিদের নির্বাসন যুক্তিগ্রাহ্য হলেও তা থামাতে পারেনি বিশ্বব্যাপী কবিতার অনিবার্য আলোকময়তা। ধীরে ধীরে বীরগাথা, পুরাণ, মতাদর্শ, রাজনাস্তুতি ও যুদ্ধবর্ণনার উত্তরাধিকার ও প্রভাব এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচারণ অপসারিত করে সেই ধারা এখন এই বিপর্যস্ত, পেশাদার, ব্যবহার-জীবী সময়ে আরো বেশি সংলগ্ন মানবতায়, আরো অন্তর্গত কবির মননে, অবচেতনায় তার বিজ্ঞানবোধে।

মার্কস ডারউইন, আইনস্টাইন ও ফ্রয়েড—এই চার মহর্ষির কালজয়ী শাস্ত্র ও জীবনবেদ যেমন কাব্যকে দিয়েছে মহাজাগতিক ব্যাপ্তি, অন্বেষণইচ্ছা ও বাস্তবতার নতুনতর ব্যাখ্যা তেমনই দুটি বিশ্বযুদ্ধ, জাতিঘৃণা, সাম্প্রদায়িকতা, আনবিক শক্তিদর্প, পুঁজিবাদ ও ট্র্যান্সন্যাশানালের সর্বাত্মক ভয়াবহতা কবিতার সামনে হাজির করেছে ব্যক্তি মানুষের চূড়ান্ত অসহায়তা, তামসিক ঔদাসীন্য, নৈরাশ্য। আর এজন্যই কবিতাই আজ জীবনমন্ত্র, ধ্যান ও প্রার্থনা।

সাহিত্য শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের নানা ধারায় বিচরণ করে বোধ আজ সুস্থিত যে কবিতা মানবতার শেষতম আশ্রয়; কবিতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সুসংহত আবিষ্কার।

'অনার্য সাহিত্যের' শেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল আট বছর আগে। নিজস্বতায় ভাস্বর, ঋজু ও দৃপ্ত সেই পত্র আবারো প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। নবপর্যায়ের এই সংখ্যাটি সমর্পিত কাব্যে কবির মনোজগতে ও সর্বোপরি মানুষের ছন্দহীন জীবনআলেখ্যে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

আমাদের তুঙ্গ সুখ

'আমার অখণ্ড প্রেম, আনুগত্য তোমাকে ঘিরেই
আবর্তিত' — এর চেয়ে মিথ্যে ভাষণের দায়ে অভিযুক্ত কেউ
হয়েছে কি কোনোদিন ?
খণ্ডে খণ্ডে বিভাজিত মুহূর্তের এক একটি সত্তার
স্থির কোনো মুহূর্তে স্বাধীন
উচ্চারণ হতে পারে '— এই নাও সম্পূর্ণ আমাকে !'

'আমাকে সম্পূর্ণ করে নাও তুমি' — এরকম
গভীর স্নেহার্ত কোনো ডাকে
সাড়া দিই; খণ্ড মুহূর্তের মধ্যে পাই কিছু পূর্ণতার স্বাদ।
কেউ কি কোথাও আছে, এই আত্মদানের গভীর
সম্মোহনে ঘর ছেড়ে পথে বের হয়নি কখনো ?

ফিরিয়ে দিয়েছে প্রেম বুদ্ধ বা চৈতন্য আরো কোনো
অমোঘ সত্যের ডাকে সাড়া দিয়ে—
সেই গূঢ় অন্বেষণ আমাদের নয়।

আমরা ভাসিয়ে দিয়ে আবেগের স্রোতে প্রিয় আত্মপরিচয়
ভেসে যেতে ভালোবাসি, তৃপ্তি পাই আত্মবিসর্জনে ;
হোক না তা মুহূর্তের—এনে দেয় অফুরাণ তৃপ্তির আস্বাদ।

আমাদের তুঙ্গ সুখ নিভে যায়, তারপর নামে অবসাদ
সমস্ত শরীরে, মনে গভীর নৈরাশ্য ছায়া ফেলে ;
মনে হয়, মনে হতে থাকে—
না পেলে মরণ হোক, এই ভেবে জড়িয়েছি যাকে
তুমুল উচ্ছ্বাসে, দিয়ে সমস্ত শরীরী উন্মাদনা—
যে কোনো মুহূর্ত শেষে বস্তুত স্বপ্নের বিড়ম্বনা
হ'য়ে দেখা দেয় ? নেই কেনো সেই পাওয়ার তীব্র সুখ।

খণ্ডে খণ্ডে বিভাজিত মানুষের এরকমই অদ্ভুত অসুখ।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাকে ঘিরে

আমাকে ঘিরেফেলা শব্দগুলো মাঝে মাঝে ঝিমোয়
আমি তখন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের খেলা খেলি
অথবা বৃত্ত ভাঙ্গার কিম্বা চতুষ্কোণ গড়ার
এইভাবে খেলতে খেলতে ঘিরেথাকা শব্দগুলো
কখন যে গ্রাফের সিঁড়ি হয়ে আমাকে তুলে ধরে
আমি মিনারের শীর্ষে উঠতে থাকি .....

ফিরে যাওয়া

সদ্যপ্রাপ্ত চুম্বনের স্বাদু তিক্ততা
রিক্ত বিভ্রম ভাঙ্গা উতল শরীর
শ্মশানের দ্বার খুলে ডাকে
যদিও বিজলী চুল্লীতে তখন লোডশেডিং...

শ্বেত ভল্লুকেরা আসে বরফের বোঝা বয়ে
সবকিছু···তিক্তস্বাদ···উতল বিভ্রম···সবকিছু
ঢেকে দিয়ে তুষার কম্বলে
তুন্দ্রার ঘাসবনে নিয়ে যায়···

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

জীবন বিষয়ক সূত্র

১.

ঝড়রাতে সমুদ্রের ভিতরের মৃত্যুর মতন এক শিলাখণ্ডে লেগে
উড়ে গেল আত্মা ডানা—
মৃত সেই জাহাজের কঙ্কাল মাস্তুল থেকে পরীপাখি উড়ে যাচ্ছে দেখি
এবং আদম ইভ নিঃসঙ্গ দ্বীপের মধ্যে খুলে বসছে কবিতার পাতা
সমস্ত ধ্বংসেরও পরে আদি নারী আদি নর এবং কবিতা বেঁচে থাকে

২.

ফুলের ছায়ার দিকে ফুল চেয়ে থাকে
মা তাকালো সন্তানের দিকে
এই প্রসন্নতা কবি জানে
সাদা পাতা ভরে উঠছে অক্ষরজননী দেখে রাত্রি শেষ হলে
পুঁথিপত্রে শুধু আলোছায়া

৩.

বায়ুমানবীর কথা আমরা কি কখনো জেনেছি ?
এমন অদৃশ্য তবু এত স্পর্শময় !
এমন সুন্দরী তবু এত ভয় হয় !
বাঘিনী সঙ্গম সুখ জানে না তো—এমন তো নয়—
সে নেই ভাবতে গেলে মনে হয় জীবনও তো নেই ।

৮০-র প্রথম পুরুষ
তাপস চক্রবর্তীর
স্নায়বিক কবিতা-সংকলন
একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু
একটি **কলকাতার হ্যামলেট** প্রকাশনা
বইটি ডাকে পেতে হলে ঃ **অনার্য সাহিত্যের** ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন

প্রবীর রায়

সেই ছেলেটা ভেলভেলেটা

টিভির দোকানে উঁকিঝুঁকি গোলাপী পা
ফুটপাতের এদিকটা বেশ ফুরফুরে
এটুখানি ছেঁড়াজামায় অতবড় ইচ্ছে নিয়ে
মালতি ছুঁড়ে দিচ্ছে হাসিচিল
ছেলেটা করুণ চোখে কুড়োচ্ছে ভাঙা কাঁচ ।

তুমি যদি সানাই শুনতেই থাকো

খুব কাছ থেকে উঠে আসবে একটা হাত
আঙুলগুলো তোমাকে খুঁজবে
তোমাকে ছুটতেই হবে রঙীণ মশারী ছিঁড়ে
সেইসব চেনাগলি চেনাপথ
নিকোন উঠোনে পেয়ে যাবে সজীব দিদিমা
আঙুল ঢুকিয়ে মুখে বলবে
—মাটি খেলি কেন ফেলেদে ফেলেদে !

কাব্য পরিক্রমা ঃ

শুভব্রত চক্রবর্তী

আঙুলের নীল নাচ ও তিন অন্ধকার ঋতু

ঘুরে চলেছে গ্রামাফোন। রকিং চেয়ারে শুয়ে কবি শুনছেন তাঁর প্রিয় গায়কের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ঘরের আলো মায়াময়, হাতে বেদনা ভর্তি মদের গ্লাস। এই স্বপ্ন যে কোনো কবিরই শেষ স্বপ্ন হতে পারে। অথবা হয়ত এটাই চরম সত্য ; বিপরীতে শহরকেন্দ্রিক ধূসর বাস্তবতা নিতান্তই অলীক। তবু ধূসর পাণ্ডুলিপির মধ্যেই লিপিবদ্ধ হয় আমাদের জীবন। সিরিনিটি হারিয়ে তখন কবিতাও হয়ে ওঠে রাত্রি অন্ধকারের ফসল। একমাত্র কান্নাই তখন রাগ সঙ্গীত।

আশি দশকের তিন কবির সেই cry বা crisis কীভাবে তাঁদের কবিতায় এসেছে এই আলোচনাটিতে আমি তাই উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি। তাপস চক্রবর্তী যখন কুমারী আবেগের মধ্যে দিয়ে তার যন্ত্রনাকে তুলে আনেন, আমরা সেই ঘোর অস্বীকার করতে পারি না। আবার শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের উচ্চারণ মন্ত্রঘণ, আমাদের আচ্ছন্ন করে রাখে এক আশ্চর্য, অলৌকিক শূণ্যতায়। আর শুভঙ্কর দাশ সক্ষম হন মস্তিষ্কের রন্ধ্র থেকে তাঁরই আত্মস্ত হিম যন্ত্রনাকে ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরায়। সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক প্রলোভন ছাড়িয়ে এই তিন কবিই লিখছেন দীর্ঘদিন। কখনো, নানা কারণে, স্বনির্বাসনে আত্মমগ্ন বসেছেন কবিতার নির্জনতার কাছে আবার মুখোরিত হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়।

অন্ধকার ঋতুতে এক নীল আত্মার চোখ

ডানা মেলেছে রাত্রি। সমস্ত চেতনা জুড়ে। স্বর্গভূমিতে ধীরে ধীরে নেমে আসছে কুম্ভীপাকের গাঢ় অন্ধকার। অনিবার্য হৃদপিণ্ড পতনের শব্দ, প্রতিশব্দের বিস্ফোরণে খানখান স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিশ্চুপ করিডোর। এই প্রতিধ্বনি কখনো সরব স্মারকলিপি, আবার কখনো বা চৈতন্যের অতলে নিঃশব্দ

রক্তক্ষরণের ভিতর দিয়ে উঠে আসা মৃত মানুষের নিজেকে খোঁড়ার বিক্ষোভ। বহুদূরে তৃষ্ণার জল ; হয়ত মরিচিকা—কিছুই নেই, না তৃষ্ণা, না ঘনঘোর বৃষ্টিধারা। তখনই নিজের দিকে ফিরে আসে কেবল ব্যর্থতার ধারালো অস্ত্রের ফলা। কুয়াশায় আচ্ছন্ন কবি সারারাত এপাশ ওপাশ করেন ব্যক্তিগত অনুভূতির বিছানায়। তাপস চক্রবর্তীর—'একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে পড়তে মনে হয় 'স্থির দাঁড়িয়ে আছি, নাকি, চলেছি—কেবলই ভ্রম জাগে!' তাপসের কবিতার বইটির মুখবন্ধ থেকে উদ্ধৃত এই পংক্তিটি আমাদের বুঝতে সাহায্য করে কবির গভীরের আত্মদ্বন্দ্ব।

মূলতঃ তিনি রোমাণ্টিক চেতনার কবি। এখানে রোমাণ্টিক শব্দের অর্থ কেবলই নারীপ্রেম নয়, জীবনযাপনের সমগ্র পার্থিব ভালোবাসার দিকেই তার লক্ষ্য। যে কোন বিষয়ে তাই তার সুখ-দুঃখের উপলব্ধি এত প্রবল, সর্বগ্রাসী ; তারই অন্তরজাত। বাইরের বিচার বুদ্ধি বা গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান সেই আত্মমগ্ন স্বগত উচ্চারণকে স্পর্শ করে নষ্ট করতে পারেনি। পারেনি কবিমনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা সরল অনুভবতৃষ্ণার মূল কাঠামো থেকে এতটুকু বিচ্যুত করতে। এ ব্যাপারে তিনি কিছুটা অবুঝ, আর অবুঝ বলেই তার কবিতায় আমরা দেখতে পাই এক আত্মব্যবচ্ছেদের রক্তময় দেশ। লক্ষ্য করি—

> প্রতিটি মধ্যরাতে স্বপ্নের মধ্যে হেঁটে যাই
> বিষন্ননগর ; তখন রাত্রির এমনই
> নিরাভ-আবরণ, অপলক চোখে যেন
> তার মৃত্যু করেছে—অন্তিম সমর্পণ
>
> (অন্তিম সমর্পণ)

অথবা—

> আত্ম-চিতাভস্মে পাণ্ডুর হয়ে যায়.....তার
> একান্ত ব্যবহৃত সমস্ত প্রসাধনী সম্ভার
>
> (ছলনা)

সমস্ত গ্রন্থটি জুড়ে এরকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যা আমাদের বুঝে নিতে সাহায্য করে তাপস এই যন্ত্রনাঘোর জীবনের প্রতি কতটা প্যাসানেট। তার ভালো লাগা বা মন্দ লাগার এক সুতীব্র অতিরাগ ফুটে উঠেছে প্রায় প্রতিটি ছত্রে, প্রায় প্রতিটি কবিতায়। রোমাণ্টিক কবির এই

passion সম্মোহনে পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে চলে বোধ ও বুদ্ধির অপার্থিব, অন্ধকারময় অনুভূতিলোকে ঃ

এমনি ভাবেই—রাত্রি যখন এগিয়ে যাবে—লঘুপায়ে
রাত্রির দ্বিপ্রহরের দৌরগোড়াতে ; ঠিক তখনই
এ বুকের নীড় ছেড়ে চলে যাস যাযাবর পাখী
(রাত্রি যখন দ্বিপ্রহরে)

জায়গার স্বল্পতার জন্য আরও কিছু কাব্যাংশ উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতেই হলো।

তিনি বোঝেন কেবল রাত্রিগুহার যন্ত্রনাই শেষ কথা নয়, সেই অশুভ চিহ্ন ছাড়িয়ে একদিন ভোর হয়—বেজে ওঠে ভৈর, টোরি। কোথাও কোথাও তাই তার কবিতায় আমরা দেখি নতুন প্রজন্মের ইঙ্গিত ঃ

তবু পদশব্দ ; একান্ত পদপ্রান্তে শোনা যায়...
নতুন প্রজন্মের পুষ্পিত বোধের বিজয় উল্লাস
(তবু পদপ্রান্তে শোনা যায়)

'একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু' তাপস চক্রবর্তীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। পাঁচ ফর্মার এই বইটিতে দেড়শোর বেশি কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রতিটি পাতাতেই প্রায় ঠাসা compose, কোনো রিলিফ নেই ; তাই পড়তে পড়তে চোখ খোঁজে কিছুটা সাদা পাতা। আমার মনে হয় কবিতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে এবং সাজানোর ব্যাপারে তার আরও বেশি যত্নবান হওয়া উচিত ছিল। যখন একজন আশি দশকের প্রধান কবির বই নব্বই দশকের মাঝামাঝি এসে প্রকাশিত হয় তখন তাকে আরও বেশি সচেতন হয়ে উঠতে হয়। গ্রন্থটি কবিতা সংগ্রহ নয়, একটি কবিতার বই—বাছাই-এর ক্ষেত্রে তাই নির্মম হওয়া দরকার।

তবু বলতে বাধ্য হই তাপসের কবিতা পাঠককে মুগ্ধ করে—এবং করবেও। গ্রন্থটির উল্লেখযোগ্য কবিতা ছলনা' 'আত্মমুখরি' 'শব্দ' 'মুহূর্ত' 'বিকল্প প্রেম' 'সেদিন এমনই মধ্যরাত' 'ঠিকানা' 'ব্যক্তিগত অনুভবমালা—৮, ১০, ১১' এবং 'খালাসিটোলার টেবিল ও তিনটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ'। না এবার থামতেই হলো, কত আর নাম উল্লেখ করবো। কারণ অনেক কবিতাই সেই দাবি রাখে। তার থেকে পাঠক নিজেই ঠিক করে নিক তাপসের কবিতার সার্থকতা।

আমি আগেই বলেছি তাপসের কবিতা ব্যক্তিগত অনুভবের উপর দাঁড়িয়ে। নারী চেতনা, অলৌকিক মৃত্যু, ভালোবাসার এক অপার্থিব আর্তি, প্রধানতঃ এই তিনের সংমিশ্রনেই তার কবিতার জগৎ।

তবে সমূহ সাঁকো পেরিয়ে যাবার
যার ছিল—একমাত্র সুতীব্র অধিকার,
কালরাতে সে চলে গেছে আত্ম-সমাধির গভীরে
একমাত্র আত্ম-শোধনকারী মাটির নিচে
(যাত্রা যখন আত্মসমাধির দিকে)

শেষ করার আগে আবারও বলি তার নিজস্ব সুখ-দুঃখ, পাওয়া না পাওয়ার অনুভূতিগুলো তাকে বিদ্রোহী করে তোলে সমগ্র ভালোবাসাহীন, নির্মম সমাজের প্রতি। আমরা পাঠকেরা শুধু বিস্মিত হই যত তাকে কবিতার ভিতরে আবিষ্কার করতে থাকি।

একটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু ঃ তাপস চক্রবর্তী, কলকাতার হ্যামলেট্ ঃ পাতিপুকুর সরকারী আবাস, ব্লক-জে-১ ফ্ল্যাট-৪, ৬৯/১ এস. কে. দেব রোড, কলকাতা-৪৮

আকাশ এখন সালভাদোর দালির নীল

সাধারণ কবিতা পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ কবিতার দু-এক ছত্রই বিশিষ্টতা পায়। এইসব পড়ুয়ারা মনে করেন বিশেষ বিশেষ পংক্তির ম্যাজিক উচ্চারণে সমস্ত কবিতাটিকে উতরে দেওয়াই কবির কৃতিত্ব। যে কবিতায় চমক নেই কোনো উল্লেখযোগ্য রচনা নয়, এবং একইসঙ্গে তা ভাবসৃজনে প্রথাবিরোধীও বটে। কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে আজ এই অমূলক গঠনরীতি প্রকৃত পাঠকের কাছে সত্যই অস্বস্তিকর। আত্মতৃপ্তির ম্যাজিকাল লাইন নয়, এ সময়ের কবিতা সমগ্রতার দাবি নিয়ে স্বজ্ঞাত উন্মোচনের অপেক্ষায় থাকে ডার্করুমের গভীর সাইনাসে। যা উপলব্ধির চেতন ও অচেতন স্তরে ধ্যানমগ্ন, গম্ভীর—অন্যদিকে বিদগ্ধ

পাঠকেরা মূর্ত রচনার বাইরে তাই খুঁজে চলেন সেই মূল অনুভূতির পরোক্ষ উচ্চারণ। শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'সালভাদোর দালির নীল'-এর কবিতা কাঠামোর আড়ালে উঠে এসেছে সেই আন্তরিক ডার্করুমের সঠিক ভাবমূর্তি।

'শূন্য-সময় তুমি সমগ্র গিলে নাও চেতন / অজ্ঞান' দীর্ঘ কবিতার এই শেষ পংক্তিটি আমাদের বুঝে নিতে সাহায্য করে শ্রীধরের কাব্য ভাবনার মূল কেন্দ্রস্থল। কবিতার নাম 'শূন্য সময় তুমি...'। যে কোনো বিষয়ের সঠিক রূপরেখা আঁকতে তিনি শারীরিক আবরণ ছিঁড়ে পৌছে যান প্রত্যন্ত অনুভূতির দেশে। যার পরে কেবল শূন্যতা, আত্মজিজ্ঞাসার বিপরীতে উঠে আসে বারবার একই প্রশ্নের প্রাচীনতম শব ; কোনো মীমাংসা নেই। এই চিরসত্যের কাছে মাথা নত করে শ্রীধর মুখোপাধ্যায় তাই তাঁর কবিতায় ধরে রাখতে চান বাহ্যিক ঘটনাবলি ছাড়িয়ে সীমাহীন আত্মার গান ঃ

আমি তো শরীর নয়, আমার শরীর
তবু আমি দাসত্ব করি তার, অযুত বছর
আমাকে শেখাও তুমি আত্মার গান, স্বরলিপি... (এই রাত)

কিংবা অন্যভাবে তুলে ধরেন আমাদের শারীরিক সীমাবদ্ধতার যাতনা

সেই চোখ সব দেখে, চোখ নয়, সেই দৃষ্টি সব দেখে
আমি তাকে দেখতে শিখিনি। (সেই চোখ)

আন্তরিক ভালো লাগে যখন দেখি একই সাথে ফ্রানৎস কাফ্‌কা থেকে গ্রাহাম গ্রীন, ফ্রয়েড থেকে এরিক ফ্রম, রবীন্দ্রনাথ বা উপনিষদ থেকে সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিতে ডুব দিয়ে খুঁজে চলেন মুখ্য জলস্রোতের স্নায়ুস্পন্দন। কোথাও আটকে থাকেন না, বরঞ্চ বলতে পারি এইসব শিক্ষা প্রণীত উচ্চারণ তাঁর কবিতাকে আরো বেশি সচল করে তোলে অচেনা অজানা অতীন্দ্রিয়লোকের পথে। অথচ কেবলই প্রজ্ঞাশাসিত, বুদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রয়োগে কবিতা রচনায় বিশ্বাসী নন তিনি ; সহজ, সাবলিল প্রকাশভঙ্গিতে তাঁর কবিতা হৃদয়গ্রাহ্যও বটে। হয়ত বইটি পড়তে পড়তে কখনো মনে হতে পারে কবি আমাদের আচ্ছন্ন করে দিতে চাইছেন শুধুই ম্যাজিক পংক্তির মোহজাল সৃষ্টি করে, পরক্ষণেই বুঝি আসলে গঠনরীতির প্রয়োজনেই উঠে এসেছে ভাষার সেই চমক। আমি আগেই বলেছি কোনো বিশেষ পংক্তি নয় সমগ্র রচনাটিকেই কবিতা করে তোলার দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি।

'সালভাদোর দালির নীল' আট দশকের কবি শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ। কবিতার বইটির বিষয়বস্তু মূলতঃ abstract —রোমান্টিকতা, প্রেম, যৌন আবেদন, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক মানুষের সাথে বিজ্ঞান অথবা নিসর্গের সম্পর্ক এবং সবশেষে যেখানে আর যুক্তি চলে না তিনি বারবার ঘুরে ফিরে আসেন সেই আদি সত্যে, আত্মার সাথে মহাআত্মার সম্পর্কে। রূপ থেকে তাই তাঁর কবিতাও ফিরে চলে অরূপের দিকে। কয়েকটি কাব্যাংশ উদ্ধারের লোভ সংবরণ করতে পারলাম না ঃ

পাঁচশো কোটি বছরের ইতিহাস কফিনে ভরে
শেষ মানুষটি মহাকাশের শূন্য পাতালে তলিয়ে যাচ্ছে।

অথবা —

এক বৈদূর্য বিষ এক প্রমত্ত আগুন নিয়ে
আমি পালাতে চাইছি
শহর ছাড়িয়ে, ভূমি ছাড়িয়ে অরণ্যের রাত্রিতে
আজ রাত ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

অথবা —

প্রশান্ত আঁধারে ভাসা নীল বিন্দু, তোকে আমি ভুলতে পারিনি

আজকের মানুষও কত অসহায়। অব্যক্ততার কাছে কবির এই আত্মসমর্পণে উঠে এসেছে হৃদয় গভীরের যাতনা ক্রন্দন।

অমনোযোগী পাঠকেরা অনেকেই মনে করতে পারেন শ্রীধরের কবিতার এক বড় অংশ যৌনালোকিত। অথচ তা নয়। প্রেমের অনিবার্য পরিণতি যৌনতা, জীবনের অনেকটাই যৌনচেতনার অধিকারে যা তিনি বিশ্বাস করেন। এবং সঙ্গত কারণে সেই প্রতিক্রিয়া তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে। তবে তিনি তা অতিক্রমে ফিরে গেছেন মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ সন্ধানে। এইখানে তাঁর কবিতার সার্থকতা ; তাঁর উদ্ধার ঃ

ভ্রষ্টাচারী মানুষদের অভিশাপ ভেঙে তুমি একবার
ব্রহ্মভেদী শীৎকার করো.....আকাশ কাঁপিয়ে...

শেষ করার আগে আর একটি কথা বলতেই হচ্ছে ঃ অনুভূত বোধ প্রকাশের জন্য যে medium তিনি কাজে লাগাচ্ছেন তার প্রতি আরও একটু সচেতনতা

আমরা পাঠকেরা আশা করতেই পারি। যেমন বেশি কথনের ঝোঁক, বিশেষতঃ যা তাঁর বড় কবিতাগুলিকে কেবল দৈর্ঘ্যেই বাড়িয়েছে দীর্ঘ কবিতার কোনো-রকম সংজ্ঞা না মেনে। শব্দ ব্যবহারেও তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী। কোথাও কোথাও যা কবিতাকে কিছুটা দুর্বল করেছে। তবু বলবো তিনি একজন প্রকৃত কবি, আর কবি বলেই তাঁর কল্পনার জগৎ নিজস্ব কুয়াশায় আবৃত।

That moves, That does not move ;
That is far off, That is very near ;
That is inside all ;
and that is outside all.

(লাইনগুলি উদ্ধার করা হলো 'উপনিষদ মননী' থেকে যা উপনিষদ উদ্ধৃত।)

সালভাদোর দালির নীল ঃ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়
কবিতীর্থ ঃ ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা ২৩

আঙুলের নিজস্ব নাচ

কীরকম হবে কবিতা রচনার রীতি ঃ আরও সঠিক ভাবে বললে কেমন হওয়া উচিত কাব্য-চেতনার রহস্যবিশ্ব? সুররিয়ালিস্ট বা মেটাফিজিকাল, ব্যক্তিকেন্দ্রিক না নৈর্ব্যক্তিক, অন্তর্জাত বিমূর্ততায় নিরালম্ব নাকি নাগরিক স্পষ্ট ভাষণে রিপোর্টাজধর্মী একমাত্রিক রচনা; অথবা এইসব আধুনিকতার সমস্ত সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে এখনকার উপলব্ধি কেবলই আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে উত্তর-আধুনিকতার চরম বিন্যাসে! দেরিদার যুক্তিগ্রাহ্য deconstruction (যা কিছুটা স্ববিরোধে আক্রান্ত) থেকে গেব্রিয়াল মারকেজের অধরা যাদু বাস্তবে বৃত্তাকার ঘুরে চলেছে রক্তের সহস্র অন্ধকারময় রাত্রিবীজ। জানা নেই কোনটি সঠিক সংবেদ, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে এই অন্তর্নিহিত চেতনার অন্বেষণ। তবে এখনো আমরা বিশ্বাস রাখি কবির প্রশ্ননন্দক গভীর সঞ্চার উপর; আর তাই ঘনঘোর কুয়াশা থেকেও উঠে আসে কবিমনের উজ্জ্বল সংকেত, নিজস্ব ভাষা। শুভংকর দাশের কবিতায় আমরা দেখি সেই নিজস্বতা, সকল প্রভাব ছাড়িয়ে

খুঁজে পাই তারই ব্যক্তিগত ও স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। যদিও উপলব্ধির শুরুতেই তিনি অনায়াসে গ্রহন করেছেন গ্রন্থজাত জ্ঞানের সকল বুদ্ধিগ্রাহ্য ইঙ্গিত, যা কবিতাকে কখনোই আবেগময় কল্পভূমির বন্ধনে দিগ্‌ভ্রান্ত করেনি, বরঞ্চ বলতে পারি মস্তিষ্কের রন্ধ্র থেকে আত্মার হিম যন্ত্রনাকে স্বার্থক উন্মেষে তিনি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন গোটা দেহের শিরা-উপশিরায়। তার স্নায়ুগুচ্ছ তাই বারবার বেজে ওঠে অবচেতনের নিয়ম আভাসে ঃ

এই যে জন্মেছি আলোপিণ্ড হয়ে সেকি তবে অন্ধকার
চোখে মধ্যরাত ছায়া নামে দৃষ্টি আঁটকিয়ে
(তারাজন্ম-২)

অথবা

জন্ম থেকে ঘিরে আছে সিলিকা কণার এই মাটি
হাতের ব্যবহার ভুলে তাকে চক্‌চক্ করি
(আঙুলের নাচ)

উপরের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কবি হৃদয়ের গভীর বেদনা তারই মেধায় আত্মস্থ হয়ে রূপ পেয়েছে এক ভিন্নধর্মী পরিশীলিত কণ্ঠস্বরে। যেখানে আবেগও হয়ে উঠেছে ব্যক্তিক্রমী। জন্ম থেকে মৃত্যু এই পরিক্রমণে বঞ্চনার উচ্চারণগুলি তাই এত গম্ভীর, স্পষ্ট অথচ মননশীল; কোথাও সামান্য ভাব-ধারাও তরল আবেগে ভেসে যায় নি।

'প্লেনের হাড়গোড়' শুভংকর দাশের অষ্টম ও শেষ কাব্যগ্রন্থ। ছত্রিশ পাতার এই শীর্ণকায় পুস্তিকাটি আমাদের নিয়ে চলে চেতনার দীর্ঘতম কোনো অনুভূতির দেশে। কবিতাগুলি পড়তে পড়তে আশ্চর্য হই যখন দেখি বিজ্ঞান, দর্শন, মনোবিদ্যার মতন পাঠলব্ধ জ্ঞান শুভংকর অনায়াসে গ্রহণ করেছেন এবং যথার্ত কবিতা করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। আমি আগেই বলেছি তার অনুভবের ভূমি নিছক কুমারী আবেগের মুক্তিকায় গড়ে ওঠেনি; এই কাজ নেহাত সহজ নয়, একজন প্রকৃত কবিই বোধহয় পারেন এভাবেই মস্তিষ্কপ্রসূত বোধ দিয়ে সঠিক কবিতাকে পথে চালিত করতে।

চোখের সিমেট্রি ভেঙে গেলে রঙ বেঁকে যাচ্ছে মাঝ বরাবর
ডান চোখে অথচ বাঁ চোখে ঝাঁ ঝাঁ স্বপ্ন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা
জল কোথা থেকে এলো হাতড়ে দেখি কিছুই লাগে না।
নাভিস্নান-২

এরকম অনেক কাব্যাংশ এই বইটি থেকে উদ্ধার করা যায়, যা থেকে আমরা বুঝতে পারি বোধের অন্তর্বয়নটি গঠন করতে তিনি কতটা সংযমী। বুঝতে পারি কবিতার ক্ষেত্রে এই সংযম কতটাই প্রয়োজনীয়। এখানে পরিসর স্বল্পতার জন্য সেই লোভ সংবরণ করতে হলো ; পাঠক বইটি পড়লেই আশা করি আমার বক্তব্যের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শুভংকর দাশের কবিতার সবটা আমি বুঝতে পারি না ; এবং আজ এ কথাও প্রমানিত কবিতা সমস্তটা বোঝার নয়। সৃষ্টির মূল সাফল্য আস্বাদিত আত্মার ভিতর বেজে ওঠায়, কোন অলৌকিক কারণে শুধুই হয়ে ওঠায়। কবিতার ভাষা নিয়ে, বর্ণ ভঙ্গি নিয়ে আজও পরিক্ষা চলেছে এবং যতদিন মানুষের মধ্যে perfection-এর সন্ধান থাকবে ততদিন নির্মানের নিরীক্ষার শেষ নেই। এই বইটির কবিতাগুলিতেও আমরা লক্ষ্য করি ভাষার নিজস্ব ব্যবহারে কবিতার আঙ্গিককে অন্য মাত্রায় তুলে ধরতে চেয়েছেন শুভংকর। মিথকথন, স্মার্ট এবং নাগরিক চেতনায় পুষ্ট এইসব লাইন বাংলা কাব্য ঘরনার বাইরে এসে আন্তর্জাতিক কবিতার অনুরূপে নির্মিত হয়েছে। যদিও ভাষা গঠনে তিনি কিছুটা জটিল তবুও বলতে হবে তাঁর কবিতার সর্পিল বেষ্টনী পাকে পাকে জড়িয়ে ধরে, কখন কোথায় ছোবল মারে জানতেও পারি না, অথচ সারা শরীর নীল হয়ে ওঠে তীব্র বিষের যন্ত্রনায়। এখানে একটি সমগ্র কবিতা উদ্ধৃতি তুলে দিলাম ঃ

গলির আকাশ পা বেয়ে উঠছে
ছিঁড়ে এসেছো সমস্ত নীল থেকে
কাঁদো। নিঃশ্বাস নাও দাঁত বসাও
কণ্ঠনালী পাক মারছে খিঁচুনি এ লাইনগুলো তোমার জন্য
মাংসের ভেতর এই অক্ষর পুঁতে দেবো ফিরে যাবে
আমি হাত তুলছি রাবারের দাগ ভ্রূণের ঠোঁট
গুটিয়ে ডুব মারছে জোলো পিচ

(তারাজন্ম-৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি টি, এস, এলিয়ট তাঁর বন্ধু এজরা পাউন্ডের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় এক জায়গায় বলেছিলেন খুববেশি নতুন আঙ্গিকের কবিতা খুব ভালো কবিতা হওয়া সম্ভব নয়। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, যে শিল্প

নিজের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সৃষ্টি হয় তা একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে কিন্তু মানের দিক থেকে তা উৎকৃষ্ট হতে পারে না। প্রতিটি প্রকৃত সৃষ্টির সাথেই যুক্ত হয়ে থাকে বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস। 'প্লেনের হাড়গোড়' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে শুভংকর বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের বিবর্তনকে মানতে রাজি নন। শিল্প সম্পর্কে শেষ কথা কেউই বলেন নি, বলা অসম্ভব। আমার বিচার ও বিশ্লেষণও হয়ত পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়। নীরস সমালোচনা মাথায় না রেখেও শুভংকর দাসের কবিতা আমাদের চেতনায় যে অলৌকিক আলোর ইঙ্গিত নিয়ে আসে সেটুকুই গ্রহণীয়, সেটুকুই ইপ্সিত, মেনে নিতে আপত্তি কেথায়।

প্লেনের হাড়গোড় ঃ শুভংকর দাশ, গ্রাফিত্তি ঃ ২এ টিপু সুলতান রোড কলিকাতা-২৬

একটা না বই /
সবার জন্য নয়। দাঁড়ি কমা সেমিকোলন ফুলস্টপের
প্যাচপ্যাচ চমকে আছে। /

দেশী মুরগী, এ্যাই গরু হ্যাট্

একটা সাদা BLACK BIBLE অথবা কালো মুরগীর সাতদিন।
এ এক অনবদ্য গ্রাফিত্তি প্রকাশনা ঃ ২এ টিপু সুলতান রোড, কলকাতা-২৬

তাপস চক্রবর্তী

সন্ন্যাস

মৃত্যুর সর্বোচ্চ শিখর থেকে বেজে ওঠে
শঙ্খনাদ, সেদিন এমনই রাত
বুকের পাঁজর ঘিরে দুঃখ-শোকের
কি নিদারুণ সহবাস। আমি যে মুহূর্তে
এ শরীর সেচ্ছাদানে চিরপ্রণম্য অগ্নির
কাছে যাই, দেখি রিক্ত ক্ষুধাদীর্ণ শরীরে
অগ্নিও নিয়েছে— অন্তিম সন্ন্যাস

ইচ্ছামৃত্যু

এখনো কি তার সাথে দেখা হতে পারে
নতমুখে তাম্রভ-তমসা নিয়ে, আলোর
পাখিরা যারা ফিরে গ্যাছে—রাত্রির নীড়ে

তখন আমি মৌনদীপ প্লাবনে ভাসিয়েছি
মহানিবেদনের অনিন্দ্যসুন্দর এ শরীর তোমাকে দিয়ে

নেপথ্যের অন্ধকার

নতজানু হতে হতে ক্রমশ শরীর ঘর্মাক্ত
হয়ে এলো, এবং বাইরে তখনো ক্রমশ
অন্ধকার ঘন হতে হতে আত্ম-আহুতির
ঠিক আগে, আমার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে দাঁড়ালো

এখন আর কোনো শব্দ নেই, নেপথ্যে শুধু
অন্ধকার অন্ধকারকে আলিঙ্গন করেছে

শুভঙ্কর দাশ

এখন আড়ালে সর্পসুন্দরী

পরিত্রাণ রোগ চাইবে বলে তাকে ডেকে আনে
এ সভ্যতার জন্য রয়ে যাবে আমাদের ছুটির প্রহর
সেই সমস্ত হাঁটুর তেকোণা কি করে মরিবে আর
একখণ্ড যোনি পড়ে আছে বহু দূরে কামাখ্যায়
যেখানে ট্যাক্সি চড়েও মোক্ষলাভ সে সময় মহিষের রক্ত দিয়ে
ক্রমাগত তিনদিন তিনরাত্রি ধোয়া হয়
উঠে গেছে দেনা জীবনের হটে আসছে হাত তার ঠেলা
আটকে যাবে ফুলঝুরি ফুটে উঠবে না
একদম শক্ত পাথর দাপাদাপি ফেটে যাবে
গেল কেন হাওয়া খেতে হয় এইমাত্র জানাছিলো
কেমন করে আছো আমার আরেকটু হাওয়া চাই
পর্দা নেড়ে নেড়ে জানালার ক্ষমা চাইছি দয়া করে
গলায় নেমে আটকাও উড়ছে এবারও
তাকে ক্ষমা করি বলি ভালো থাকার কি দরকার ছিলো
এভাবে সমানে হাত ছুঁড়ে দেবে রক্ত
শিরা থেকে মাথাফুঁড়ে খুঁজে নেবে সিলিং কোথাও
ওগো এগুলোই ছিলো শুধু বানানো সমতা
চেনো নাতো খেলো খেলা খেলি শেষে কোয়াগুলেশনের থিয়োরীর সর্বনাশ গেছে
ভাঙাভাঙি ইণ্ডিভিজুয়াল শব্দর পর শব্দ জোড়ে নাতো
পেনের খসখস হয় কাগজের ভয় ধরে যাবে হাত রাখলেই
আস্তে আস্তে থামা এখন পৃথিবীকে আস্তে মিলিয়ে নেওয়া যেতে যেতে
উড়ে যাচ্ছে হৃদয়ের পরিচয়
তুমি দেখতে পাচ্ছোনা পরে দেখবো
এখানেই শান্তি ছিলো টায়ার আঘাতে
ম্যানহোলের ধাতব ঢাকনা বেজে ওঠে শোনা যায় তার ঘুম
এখন কোনো ক্লান্তির রাত নেই
নেই কোনো খোঁজ শরীরের খণ্ড খণ্ড শ্রম
ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতদূরে এভাবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে আনন্দ হাঁক লালা
বেলা জাগে এখন আড়ালে
চোখের ভেতর এ্যাত পিটপিট স্নেহ
ক্লান্তিহীন পারাবার রস ভুলে থাকে
ভুলে থাকে এ সময় সংহিতা
যত ইচ্ছা পারার কাব্য স্লেট চামড়ার কোনো রহস্য আঙুলের

শুভব্রত চক্রবর্তী

পাথরের চোখ

ভুল গাছ আটকে রেখেছে সন্ধ্যার আকাশ ;
এমন অনেক পাতা আছে, শাখা-প্রশাখা যাদের জন্মের পরেই
সেই ছায়ার আড়ালে লুকায় শেষ বিকেলের অলীক যতিচিহ্ন,
প্রতিস্থাপনের দিকে তখন ক্রমশ টিভি অক্ষরেরা ডেকে নেয়
নকশা স্ক্রিন, স্বপ্ন মাখে না খেলার মাঠ বা ঘুমন্ত সিঁড়ি
পাকশালার গভীরে কোথাও নীরবতা, কোথাও পাগল ঠোঁট
ভেজা শরীরের গন্ধ থেকে জীবের বুড়ো স্বাদ কান্না হয়ে
দুলে ওঠে কেবল চশমা ভাঙা রাত্রির ঘোলাটে চোখে,
নুন পাথরের শূন্যতা
বৃষ্টির হাত পা ছোঁয়, ভেসে ভেসে চলে যায় স্থির জন্মের ভিতর।

শর্মী পাণ্ডে

রোদ / তিন

গলা দিয়ে নেমে আসে নিরাকার রোদের অসুখ
ফুলের মতোই দলা করে রোদ ভালোলাগে আমার
কাটগ্লাস ঘিরে রাখি জলের ভেতর
ঘর জুড়ে বেড়ে চলে—লাল নীল হলদে সবুজ রোদের নাচন
রোদ শিশু জন্ম নেয় পড়ে থাক বাক্সের নিচে
আমার সকাল কাটে টুকরো টুকরো কোরে দ্যায়
সারাটা দুপুর আনাচ কানাচ জুড়ে বেড়ে চলে
পর্দা ধরে দোল খায় আয়নার কাঁচ কাটে অবিকল
বোকার মতো ছায়া কাটে নিজেই নিজের
প্যাপড়িরা ঝরে পড়ে কাটগ্লাস পরিহিত সাদা সাজানো
রোদ থেকে যেকোন পুরোনো অ্যালোপ্যাথি বড়ি
গুলে দিলে জানা গ্যাছে রোদ আরো কিছুকাল
সতেজ সবুজ থাকে আলো দ্যায় ঘরের ভেতর

সুমিত মৈত্র

ভ্রান্ত পর্যটন

নিজের বুকের দিকে মাঝে মাঝে মুখ নেমে আসে
কাকে তুমি সত্য বলো আজ, কাকে মিথ্যে, খুঁটে দেখি—
লোহার ফটক কোন অভিমুখ খুলে রাখে উত্তরে পশ্চিমে
চলেছি লেহন ক'রে নিজ বিম্ব আলো অন্ধকারে
বৃক্ষের শাখায় রয়ে গেছে অনাস্বাদিত সে কোন
ফল, মাঝে মাঝে মুখ নামে তার বিচ্ছুরিত স্ফটিক তরলে

রোদ এসে হেলে পড়ে আর্মেনীয় স্কুলে
আমি ঘুরে দাঁড়ালেই নগর নটীরা নেমে আসে সারি সারি
পরিচ্ছন্ন দোকানীর চোখ থাকে চিকের আড়ালে
ডিমগুটি থেকে এই ভ্রান্ত পর্যটনে
পিছনে পাতার শব্দ, সম্মুখে জখম রোদ প'ড়ে

অমিত ঘোষদস্তিদার

এস্রাজ

জীবনকে বাজাবে বলে নানা অজুহাত গুণময়
সংকীর্ত্তনে বেজে ওঠে দিন আগত সুদিনে
শিহরিত মন আশাঘরে সুজন বন্ধু চারিপাশে
গান দুঃখিত মানুষ মেশে নদীর মতন হে
জীবন তুমি যত পারো বাজো তোমার
মূর্ছনায় আমি সজল শিহরিত

অমিস্রাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

যা কিছু সাম্প্রতিক মনে হয়

জানালার মরচে গরাদ, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি, চোখ বুঝে কিছুই দেখছি না
শুধু শুনছি ভৌতিক গোড়ালির শব্দ ফেলে কারা উড়ে গ্যালো পাখাবিনা
ক্রমাগত নীল আকাশের খোপ থেকে ডিটারজেণ্ট সাবানের মতোন
সাদা হাঁস বাতাসে ওড়াচ্ছো, সুলোচনা

মনে হলো আমার কোনো শ্রম, আত্মমৈথুন বৃথা নষ্ট হবেনা এবার
ছোট্ট লিঙ্গ নেড়ে চেড়ে আমি বুঝি উজ্জ্বল, প্রতিশ্রুতিময়
কবিতা লেখার দিকে ফিরে যাব আবার নেশাবিনা
জানালার মরচে গরাদ, আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি—তুমি ক্রমাগত
নীল আকাশের খোপ থেকে ডিটারজেণ্ট সাবানের মতোন
সাদা হাঁসগুলি বাতাসে ওড়াচ্ছো, সুলোচনা

এই নষ্ট প্রদেশ ছেড়ে আমি চলে যেতে চাই শিলং পাহাড়ের দিকে
হয়তো বা পদব্রজে, ক্যানোনা খসড়া খাতা অসম্ভব দিগ্বিদিক লেখায়
ভরে গ্যাছে, হয়তো বা জলপথে—বনবিচুটির চুলকুনি পথে –
মাদার টেরেসার সৌখিন সবেদা বাগানের পাশ দিয়ে, এবার
আমার খাতা প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখায় ভরে গ্যাছে
প্রতিবেশীদের সংগে বিবাদ ঘটেছে, বাপ-মার সংগে ঘটেছে দূরত্ব,
-খালাসী টোলায় মাতাল উৎসবে আমার ততখানি আহ্লাদ হলোনা—
হেরোইন পুরিয়া গুলো যত প্রিয় ছিলো আজ তারা তত প্রিয় নয়.

"আমার আত্মার মাঝে বারে বারে কেঁপে ওঠে গভীর গভীর উট।"

কুমারেশ চক্রবর্তী

নাগরিক

বউয়ের রুপোর মাকড়ী বেচে
তোমার মানত রেখেছি ভগবান।
কঠিন অম্বলের ব্যামো। কোবরেজের বারণ।
তবু তোমার জন্যে প্রতি সোমবারে না-খাওয়ার ব্রত!
ওপাড়ার শনিমন্দির। দিনের শেষে আবছা আলো।
অল্প স্বল্প নেশা—
দুঃখরা সব বন্ধু হয়ে ওঠে
ঘরে ফিরে তোমার সামনে কোনো কোলাহল করিনা
অনুযোগও রাখিনা একটুও—

বল দেবতা আমার
আমার ভাঙা থালার বাসী ভাতের পাশাপাশি
এ কোন্ শর্ত রেখেছে রাষ্ট্র?

ধুম জ্বর। ঘোরের মধ্যে খোলা চোখ!
বেয়াদপ ছেলে।
কোন অপদার্থকে ডেকে ওঠে বাপ!
বারবার আমি-ই বা ভুল শুনি কেন?

ধ্বংস চিহ্নে লিখে দিয়েছ নাম
নিয়েছ শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, আমাকে নিঃস্ব করে
বাজেটে রেখেছ প্রচুর কর্মসূচি
তবে কেন এ দেশের নাগরিকত্ব নিলে না!

অরূপ চৌধুরী

গ্রহণ

চ্যানেল যোগাযোগ ছিন্ন
বন্ধুত্বে গ্রহণ
সেলোটেপের ভেতরে
দম চেপে শুয়ে আছে আমাদের
কথাবার্তা ও কোটাল
ছুরি হাতে এইমাত্র কারা যেন
দৌড়ে গ্যালো করিডোর
কারা যেন দরজায় তুলে দিলো
ছিটকিনি ও চেন
চাপা গোঙানি ছাড়া এখন
আর কোনো আওয়াজ নেই
এবং হাতপাহারা ছিটকে অই
বেরিয়ে যাচ্ছে লাঠি ও হুইস্‌ল
গেটখোলা চারপাশ
বাতাসে চমড়া পোড়াবার গন্ধ
ভেসে আসে নেকড়ের হাসি
কুকুরের হল্লা ও ক্ষুর
দুহাতের ভেতরে সেই স্তন কোথায়
মা-গন্ধ কোথায় শিশু ভাবে
তিনরাত নির্ঘুম চোখে টসটসে জল
ছিঁড়ে পড়ে মাথা মাইগ্রেন
পাশে বাঁটি-দা-নিড়েনি খুরপি
দরজা খুলে বাইরে আসি
ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে টোকা মেরে
খুনদাগে রাস্তায় নামি

প্রফুল্ল দাশ

মুহূর্তের চিত্রাবলী

১. দূরে কোথা উড়ে যায় শিমুলের রোঁয়া
চৈত্রের দিন ঝরে যায়,
ধূসর ঘোড়ার গাড়ি চড়ে যে যায়;
সে যায়, ফিরে আর আসে না কখনো।

আকাশের দূরে, বহুদূরে, একা
উড়ে চলে শুধু এক মন্থর চিল।

২. হাওয়ার রূপান্তরে
বাহিরে ও অন্তরে
ঘটে যায় ঘোর সংক্রমণ।
বাতাস সেকথা জানে,
মেঘও জানে,
জানে বনস্পতি
জন্মের ক্ষণের কথা কানে কানে বলে যায়
দীপ্র ত্বিষাম্পতি।

৩. ঝরে জল অবিরল মালতীলতায়
শুশ্রূষার সুর ভাসে জলজ হাওয়ায়
সৌরভে বাতাস মুগ্ধ, আপাত বিহ্বল
ফুলের সৌন্দর্যসুখ ক্ষীণ সমুজ্জ্বল।

ঝরে জল অবিরল মালতীলতায়
ঝরে ফুল টুপ্‌টুপ্‌ জলজ হাওয়ায়
মুগ্ধ চরাচর, মুগ্ধ দিগন্ত সৌরভে
মালতীর ফুল ঝরে বিপন্ন গৌরবে।

৪. চোখ খুলে দেখি যে সংসার
বন্ধ হলে দেখি না কিছুই
এই দৃশ্য, বর্ণ, ফুল ফল
মিশে যায় আঁধার শরীরে।

সে আঁধার আলো হলে,
ধীরে ধীরে খুলে যায় প্রকৃত আড়াল।
বর্ণময় ফুলেদের বর্ণবহুল ফুলদল
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে মুক্ত অন্তরাল।

মানস কুমার রায়

বাসগৃহ

ছিটকে যাই অকস্মাৎ আলো থেকে অন্ধকারে
ছুঁড়ে-দেওয়া কমলালেবুর মতন,

বিশ্বাসহীনতার ঢেউ প্রতিহত হতে হতে
ফিরে আসে বিশ্বাসের রাজপথে,

অভিমান থেকে রাগ ওঠে আর ঝরে পড়ে
তার বিস্তার ঘটে আকাশ অবধি,

যে-নিরুত্তাপ শান্ত পরিধি খুঁজেছিল মন
সেখানে আজ ঘোর বিস্ফোরণ,
তমসাঘন এই সময়-সাঁকোর এপারে-ওপারে
মিথ্যে জ্বলে অছে সত্যের মতন,

শীতরাতে অগ্নিকুন্ড ঘিরে গল্পমত্ত যদিও
ভুলিনি কখনো,

পারমানবিক চুল্লির পাশে
আমাদের আজকের বাসগৃহ।

এক যুগ্ম কাব্যগ্রন্থ যা এসময়ের ঋদ্ধ কবি
শুভব্রত চক্রবর্তীর আলোকে ঝলমল
ভৈরবী ও শ্মশান ভস্ম
পঁচিশে বৈশাখের কবিতা ঃ ১৪৯/১ জ্যোতিষ রায় রোড, কলকাতা-৫৩

মনীশ সিংহ রায়

নিভৃত হল্‌কা

কিছুই থাকে না জীবনে, শুধু কিছু স্মৃতি ও মায়া
আর থাকে ভালোবাসার ইতিহাস যা পুরুষকে পোড়ায় !

পরী, তুমি কেন পরী। যদি পুরুষই না থাকে !!

পরীর শরীরের নীল অন্ধকার বিষে
প্রতিদিন যে করেছে স্নান ; তার ডানার
শীতল হাওয়ার ধাক্কায় যার প্রেম ছিল
ক্রমবর্দ্ধমান ;—কেন তাকে অবশেষে
উপেক্ষার নিস্তব্ধ আবরণে দূরে রাখো, পরী ?

ভালোবাসার সমাধি ফলকখানি গলার মেডেল করে
আজ পুরুষ ঘোরে পথে ;

জানলায় এখন আর ভাসে না মেঘ
শুধুই পরীর ছায়া—অবয়ব ;
ফলতঃ পুরুষ যেন আকাশমুখী শব।

এখন রূপহীন, আলোহীন, ইতিহাসের
নিভৃত হল্‌কা এসে পুরুষকে পোড়ায়...

কেন এত শাস্তি পুরুষের, পরী ??

উত্তর বিশ্বাস

বাষট্টি সালের টায়ার

আমার গলা বেষ্টন করে আছে
বাষট্টি সালের টায়ার। আমি দেখতে পাচ্ছি
টিউব ফুটো হয়ে সাপের মত প্যাচানো
আর লকলকে মাফলার জুড়ে
জলপাই রঙের পিকাসোর ছবি।
কী অদ্ভুত কাদাজলের শৈল্পিক শিবির
আমার চারপাশে। আমার মাথার ভেতরে
হেমন্তের পাতা, দু'চোখে কলুর বলদ
আমি দেখেছি গ্রাম খেয়ে নগর, নগর খেয়ে শহর
আর শহরের ভেতর বেড়ে উঠেছে ব্রহ্মদৈত্য
এই সব দেখতে দেখতে বাষট্টি সালের টায়ারে
ভেসে যাচ্ছি আমি

আমি শুনেছি সেইসব শেয়ালের ডাক
দেখেছি গুমোর ফাটানো ইদুঁরদের দৌড়
দেখেছি ছাতার দোকানে বারুদ আর বিয়ের পিড়িতে কেরোসিন
গোঞ্জির পরিবর্তে বর্ম আলোর বদলে গ্যালন গ্যালন আঁধার
তৃণভূমির পরিবর্তে ধড়মুণ্ডু আর দ্রোণাচার্যের বদলে একলব্য
এইসব দেখতে দেখতে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে
সত্যিই দেখেছি চাঁদটা ঢুকে যাচ্ছে শহীদ মিনারে
আর প্রাচীন বৃক্ষটির ঝাঁকড়া চুল থেকে ঝরে পড়ছে রৌদ্রালোক
সেই রৌদ্রালোকে আমি পথ খুঁজি
না কুড়ানো পথ
টুকরো টাকরা স্মৃতি গুলো খুঁজি
কিছটা পথভ্রম হলে চৈত্রের শূন্যতা থেকে
তোমাদেরই প্রিয় পলাশ আমাকে সখ্যতা দেয়
আমি ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকি

আমার বিস্মিত চোখের ভেতর খুঁজে ফিরি
স্বয় সম্পূর্ণ স্বপ্ন, স্বপ্নের ভেতরে অঙ্কুরিত বীজ
বীজের ভেতরে রেণু।
আমার মৃত্যু মুহূর্ত পর্যন্ত রেণুতে রেণুতে
সংঘটিত হয় বিপ্লব। আমি টিকে থাকি।
আমার শ্যাঙলা মাথা হাড় ও মাসের ভেতর থেকে
গজিয়ে ওঠে পাতা, লতা গুল্ম, সর্যেদিয়ের আকর্ষণ।

অজস্র ক্ষয় আর প্রতিঘাত থেকে আমার এই অর্জন
আমাকে আর যুদ্ধের কথা বলো না
আমাকে আর পরমানুর কথা বলো না

আমার কাছে কোন ভাবেই ৬ই আগষ্ট কোন যুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়
আমার কাছে পাখি আর বারুদ সমার্থক নয়
আমার কাছে ভাত আর সূর্য এক
আমার কাছে প্রেম আর বৃষ্টি অভিন্ন

আমার কাছে পথের কথাও বলো না, ঝড়ের কথাও না
আমার কাছে বন্ধুর কথা ও বলো না, ঠাকুদার কথাও না
কেননা, আমি নিজেরই অজান্তে কখন যেন দেখে ফেলেছি
১৩ হাত বিচির প্রসিদ্ধ সেই ১২ হাত কাঁকুড়।

সুবিমল বসাক
বাংলায় এক সাব-অলটার্ন নভেল
ভাষা, শ্রেণী-সংগ্রাম চেতনা, আঙ্গিক, চরিত্র, উপস্থাপনা এবং
ভঙ্গিমায় উজ্জীবিত এক অভিজ্ঞতা
হাওয়া ৪৯ প্রকাশনী ঃ ব্রহ্মপুর, বাশদ্রোণী, কলকাতা-৭০

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

ঋত স্বপ্রকাশ

গেরুয়া নদীর জলে অস্মিতা হারিয়ে আসে ঘৃতাঙ্গী বালিকা

দশদিক আলো করে এই যে সকাল
এই যে মহুয়াসুর উদ্ভিদ ভাষায়
সবকিছু হয়ে ওঠে বালিকাশরীর
মাত্রাতিরিক্ত শক্তি ও কণিকার ঢেউয়ে উথালপাথাল
মধুস্রাবী তার দেহে প্রজাপতি নাচে

বস্ত্রখণ্ড ভেসে গেছে প্লাবিত লাবণ্যে তার
উন্মুক্ত কেশদামে স্তব্ধ নক্ষত্র আগার
কামনার সুস্থিত রীতি এইবার ভঙ্গ হয়ে গেল
প্রকৃতি বিরুদ্ধ গানে বালিকা মাতাল
পুষ্পিত তার যোনি স্বপ্ন জন্ম দেয়
বুকের কুসুমদুটি ছন্দ-বর্ণ-তান

স্বরূপ বালিকা ওই
কালকে নিশ্চিহ্ন করে ঋত, স্বপ্রকাশ
২৪।১১।৯৬

শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

ফসফরাস

ছয়লাপ মিনারের বুকে
ঘামের লবণ গন্ধ উজ্জ্বল মুখ
পায়ের পাতা ঝরার স্পর্ধা নিয়ে
থমকে থাকা বিকেলের শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়া
নির্বাক দৃষ্টির অদ্ভুত জ্বলে ওঠা ছাব্বিশ বছরের তৃষ্ণা।
দীঘল ভুরুর প্রতিটি রোমের গভীরে
যাযাবর পাখির কয়েকটা ফসফরাস ফিশের ডানার শব্দ

ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গদ্য কবিতা

গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে 'কবি'র মন্তব্যের সাহায্যে অনুভূতি বাড়ে, রুচিও সৃষ্টি হয়, সীমানা নির্ধারিত হয় না নিশ্চয়ই। কিন্তু ঐ প্রকার শ্রেণীবিভাগ কী জাতি-বিচার অসম্ভব। এখনও পর্যন্ত কোনো আলোচনা তত্ত্বের পুস্তকে কবিতা ও গদ্যের সীমানা ঠিক হয়েছে জানেন কি? না কেউ তাই পড়ে গদ্যের ও পদ্যের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করে? যে করে তার কোনো কিছু না পড়াই ভালো। সীমানা নিয়ে মাতামাতি academic mind-এর চিহ্ন, অর্থাৎ যারা কাঁচামালের ব্যবসায়ী তাঁদেরই। যাঁরা সাহিত্য-রসিক তাঁরা অবশ্য সীমানা নেই বললেন না, কিন্তু রুচি ও অনুভূতির উপরই জোর দেবেন। কোনো গূহ্য ধর্মের ইঙ্গিত করছি না! সাহিত্যিকের কেন ভালো লাগল তাকে বলতেই হবে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সে ব্যাখ্যা উপভোগের পরে। পরে বলেই ব্যাখ্যায় ভুল হওয়া সম্ভব। ব্যাপারটা rationalisation-এর সমপর্যায়, সমস্তরে নয়, derivative বলতে পারেন। সেজন্য গদ্য-কবিতা সম্বন্ধে আমার মতামতের ঐকান্তিক সততা সম্বন্ধে আমি নিজেই সন্দিহান। আপনারা নিজে চিন্তা করে দেখুন। আমার আপাতত যা মনে হচ্ছে তাই লিখছি। চিঠি প্রবন্ধ নয় তাও মনে রাখবেন।

প্রথমেই ওঠে দৃষ্টিভঙ্গির কথা। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দুই প্রকারের। এক হলো বাইরের সত্তাকে স্বীকার করা, আর এক নিজেকেই প্রামান্য ভাবা। স্বীকারের intensity অনুসারে প্রকাশ ভিন্ন হয়। পুরোপুরি অহঙ্কারের চূড়ান্ত অবস্থা (তথাকথিত) বৈজ্ঞানিকের তাকে বাদ দেওয়াই ভালো, কারণ গদ্যকবি আর যাই হোক তিনি বৈজ্ঞানিক নন, কারণ গদ্যকবি এক ধরনেরই কবি। অন্যদিকে মাত্র আত্মোপলব্ধিকে বরণ করেন হয় যোগী, না হয় পাগল। চিত্রে ও ভাস্কর্যে তার দৃষ্টান্ত dadaism, সাহিত্যে জয়েসের ইদানীংকার রচনা এবং শ্রীমতী স্টাইনের কবিতা। ভাষা যদি একাধিকের সম্পত্তি হয়, তবে যোগী পাগল কিংবা এই সাহিত্যিক সম্প্রদায় ভাষার অপমান করে থাকেন। অতএব আমরা মধ্য পথেরই পথিক হব। নচেৎ গদ্য কবির বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বুঝব না। এখানে অনুপাতের কথা ওঠে।

কবি মাত্রেই যে ঘরমুখো ও অন্তর্মুখী মানতেই হবে, সে বাহিরকে নিজের বাড়ির অঙ্গন ভাবে। নিজেকেই সে সমগ্র বিশ্বের axis বিবেচনা করে,—রোম্যান্টিক কবিরাই অবশ্য বেশি। বাঙালিরা কেবল কেন, আজকালকার ইংরেজরাও এই রোম্যান্টিক কবিতাকেই একমাত্র কবিতা ভেবেছে বলেই তার বিপক্ষে বিদ্রোহ করছে। ইংরেজী সাহিত্যে সে প্রতিক্রিয়ার ফল এলিয়ট প্রভৃতির কঠিন কটমট কবিতায়। বাংলা সাহিত্যে সে বিদ্রোহের রূপ গদ্য-কবিতায়। পার্থক্য এই—এলিয়ট বিদ্রোহের ঝোঁকে পদ্যের মিল পদ্য থেকে নির্বাসন তো করেননি, বরঞ্চ নাটকে পদ্যরূপ দিতে চেয়েছেন—হয়তো সার্থকও হয়েছে। আমরা মিল পর্যন্ত ত্যাগ করেছি পদ্য থেকে এবং কবি নিজেই এই বিদ্রোহের নেতা। কিন্তু কোনো বিদ্রোহ নঙর্থক নয়। তার সদর্থ হলো আপন-পরের, ঘর-বাহিরের, অন্তর্মুখিতার সম্বন্ধের, আরও খানিকটা পর, বাহির ও বস্তুসত্তা ঢুকিয়ে দেওয়া। অথচ যেন সম্পূর্ণ ব্যক্তি-সম্পর্ক রহিত না হয়, কারণ তা হলে কবি বৈজ্ঞানিকের কোঠায় পড়বে। একবার ঐ সম্বন্ধে বস্তুসত্তার জোর বাড়লে আত্মকেন্দ্রিক সব মনোভাবগুলো দমে যাবে—অর্থাৎ নদীকে তখন আর নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের পটভূমি বলে মনে হবে না, চাঁদ আর তখন প্রেমিকের উদ্দেশ্য সাধনের পর অস্ত যাবে না, সেই সঙ্গে অকিঞ্চনেরও খাতির বাড়বে। এই আলোচনা থেকে একটি তথ্য বেরুল—anti-romantic মনোভাব। বস্তুর প্রতি কোনো রোম্যান্টিক কবির attitude অপেক্ষা গদ্য-কবির attitude হবে বেশি সশ্রদ্ধ! আপেক্ষিক নিষ্কামতা গদ্যকবির রচনায় থাকা চাই।

তবু, ক্ল্যাসিকাল কবিতায় মিল আছে কেন, প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়েই গেল। গদ্যকবি কি বাথটবের নোংরা জলের সঙ্গে খোকাকেও নর্দমায় ফেলে দিয়েছে? অনেক সময়ে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু সব সময়ে নয়। যেখানে গদ্য-কবিতা স্বকীয় মহিমায় সম্পূর্ণ, সেখানে ক্ল্যাসিকাল কবিতার সঙ্গে সেটি বস্তুসত্তার প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধায় সমগোত্রের নিশ্চয়ই! অবশ্য এই ধরনের মিলযুক্ত কবিতা আমাদের সাহিত্যে নিতান্ত কম (এক আছে ছড়া)। একে পরাধীন জাতির আত্মসর্বস্বতা ও কর্মহীনতা, তার উপর উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব। তবু আমরা ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি পড়েছি, তাই ইংলণ্ডের ক্ল্যাসিকাল মনোভাব কী ছিল কল্পনা করতে পারি। আধুনিক বাঙালি কবি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে অপরিচিত, পরিচয়ের মাত্রা জোর মেঘদূতের সঙ্গে, যে মেঘদূত

সংস্কৃত সাহিত্যের মণি হলেও তার দেহ নয়, প্রাণও নয়। ক্ল্যাসিকাল মনোভাবের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত মহাভারত। যদি আমরা কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদও পড়ে থাকি তবু আমরা খানিকটা বুঝতে পারি। এইটুকু বলবার উদ্দেশ্য যে, প্রতিক্রিয়ার বশে মিল না ছাড়লেও আমাদের চলতো, যদি আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের একাংশের প্রবাহে ভাসতে পারতাম। সংস্কৃত ভাষায় এত বিস্তর শব্দ আছে, যার প্রয়োগে কবির নতুন মনোভাব বেশ ফুটে উঠত এবং সেই সঙ্গে মিল ত্যাগ করবার প্রয়োজনও হতো না। সুধীন্দ্র দত্তকে সংস্কৃতজ্ঞ কেউ বলবে না, তার জ্ঞান ও প্রবৃত্তি নিতান্ত আধুনিক, তবু সে মিল ছাড়ল না, বিশেষ্য-বিশেষণের ঘষা পয়সা সে-ও চালায় না, কিন্তু ভীষণ শক্ত অর্থাৎ অপরিচিত কথা প্রয়োগে সে দু'কুল রক্ষা করে, কথা অবশ্য সংস্কৃত ভাষার। তার বস্তুসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের ভঙ্গিটি বিচারযোগ্য নিশ্চয়ই।

আধুনিক গদ্যকবিদের মিল ত্যাগ করার একটি কারণ ধরা পড়ল সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুব পদ্ধতির সঙ্গে অপরিচয়, শক্ত অপ্রচলিত কথার প্রয়োগে ভয়। সেই ভয় নানাপ্রকার...লোকে বুঝবে না, রসোপভোগে বাধা পড়বে, গণ্ডিবদ্ধ সাহিত্য হবে ইত্যাদি। অতএব, হুইটম্যান, লরেন্স? তারও প্রয়োজন নেই, প্রমাণ হয় প্রমথ চৌধুরীর সনেটে। সেগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংলণ্ডে লেখা হতে পারত। প্রমথবাবুর মনে কোনো...রোমান্স নেই—তিনি হয়তো গদ্যকবি হতে পারতেন।

কারণটি খুব গুরুগম্ভীর ধরনের মনে হবে না জানি। তাই এমন একটি অন্য কারণ বলছি যাতে আপনাদের প্রতীতি জন্মাবে সহজে। কবিতায় যখন বাক্যসম্বন্ধ করা হয় তখন একটা-আধটা বিশেষণ থাকেই থাকে। বিশেষণের এক প্রকার মনের (ও বয়সের) উপর এমন প্রাদুর্ভাব যে, তার জোরেই অর্থ সৃষ্টি হয়—যদি অর্থবাহী মিল সম্ভব হয় তবে বহুত আচ্ছা, নচেৎ বিপদ বাধে। বিশেষণ আমরা বেশি সেধেছি—উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক বিশেষণ আমাদের করতলগত, আঙুলের ডগায় কলমের মুখ দিয়ে সহজেই বেরোয়। মিল খুঁজতে, রবীন্দ্রনাথের পর, বেশি কষ্ট হয় না। তাই এত যুবক এত সমজে অমন চলনসই কবিতা দেখে। কিন্তু বস্তুসত্তার প্রতি অধিক শ্রদ্ধা জানাতে গেলে বিশেষ্যের উপর নতুন সম্বন্ধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধার জন্য ক্রিয়া ও অব্যয়ের উপর বেশি ঝোঁক দিতে হবে। আমাদের অভ্যাসে বিশেষ্য কম, ভাষায় ক্রিয়া কম—সবই অস-মাপিকা, মোহনবাগানের বিপক্ষের গোলের সামনে খেলার মতন অব্যয়গুলোও

নড়বড়ে। অনাধারে লোকে বুঝবে না তাই সহজ কথার ব্যবহার, জানি না তাই পুরাতন ঘষা পয়সার চালান করতে বাধ্যবাধকতা আসে। মনে কিন্তু ঠিক হয়ে গেছে, ঘষা পয়সা আর চালানো উচিত নয়। দু'টোয় বিরোধ বাধে···তার নিষ্পত্তি করা হয় মিল করে। বিশেষণও সেই সঙ্গে ত্যাগ করতে হয়। যদি কোনো গদ্যকবি বিশেষণের মোহে আচ্ছন্ন থাকেন দেখি, তবে তাঁর মামুলি কবি হওয়াই ভালো ছিল মনে হয়। এটা হলো পরীক্ষার দ্বিতীয় compulsory প্রশ্নের উত্তর। বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া নিয়েই বাক্য, অন্তত অধিকাংশ কবির বেলায় তাই। অল্পসংখ্যক লেখকের রচনায় অর্থের তাগিদে বাক্য রচিত হয়। বিশেষণের চাপে অর্থভ্রষ্ট হয় না তাঁদের। সাধারণত অর্থেও নতুনত্ব থাকে না। কিন্তু যাঁদের অর্থ নতুন, অথচ বিশেষণ পাচ্ছেন না, তখনই তাঁদের গদ্য-কবিতা লেখার প্রবৃত্তি সার্থক।

সেইজন্যই লিখেছিলাম, গদ্য-কবিতাকে কেবল নতুন আঙ্গিক হিসাবে ধরলে চলবে না। তার অন্তরের মনোভাব ও অর্থের নতুনত্ব—অর্থাৎ তার content-এর তাগিদে গদ্য-কবিতাই inevitable কী না দেখতে হবে। ক্ল্যাসিক্যাল্ কবিতা মামুলি হলে বাজে গদ্য হয়, আর আত্মসর্বস্ব কবিতায় গা পুড়িয়ে ওঠে —দু'এর মাঝখানে গদ্যকবি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অন্যধারে কিন্তু বিশেষণের খাদ্যাভাবে, মামুলি মনোভাবের আবহাওয়ার অনভ্যাসে মধ্যস্থিত বিগয় শুকিয়ে যায় —তাই তাকে দেখায় কঠিন, রুক্ষ, ascetle ইত্যাদি।

১৩৫৬

বহু প্রশংসিত, এক কাব্যগ্রন্থ
যাকে পাঠক বিজ্ঞাপনহীনতায়ও গ্রহণ করেছেন অপূর্ব

সালভাদোর দালির নীল

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

কবিতীর্থ ঃ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩

Anarjyo Sahitya. Naba Parjaya : 1, Summer 1997 5.00

...further charged with a
crime against humanity in the murder
of fourteen jews at Dombey June 15, 1944.
মারিওনা হমরে ঐসন নজরিয়া
নজরিয়া মে বিরাজে ধারি কাটারিয়া
কি হম্মর জিয়া ঘাবড়ায়ে
Trotsky thought it fit to decline....
Trotsky himself proposed that in spite of everything
Stalin, as general secretary, should make the
main presentation.

তুমি যদি উন্মেষশালিনী না
হইবে, তাহা হইলে তো আমার এই সায়াহ্নকালের অকিঞ্চণ
প্রবজ্যা বন্ধ্যা অনুরাগের ভিতর মূর্ছিত হইয়া পড়িবে

উদ্ধৃতি ঃ

প্রচ্ছদ : ১. ঈশোপনিষৎ ॥ ১৫ ২. রিচার্ড বাক, 'ইলিউশান'
৩. প্লেটো 'রিপাবলিক' বুক X

শেষ পাতা : ১. রায়াণ মুর, 'স্টেট্‌মেণ্ট' ২. সুবিমল বসাক, প্রুববীজ
৩. হীরেন মুখোপাধ্যায়, 'দি স্তালিন লেগাসি'
৪. ভূমেন্দ্র গুহ, 'ঋতুচক্র'

প্রকাশক ঃ
দেবযানী মুখোপাধ্যায়
২৬হিড/১ বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ
ব্লক-এ, কলকাতা-৫৫

মুদ্রণ ঃ
মিণ্টু প্রিণ্টার্স
১১২ রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৯